Volume 11, Issue 2, 2024, 66-88

International Journal of Social, Political and Economic Research
ISSN: 2667-8810 (Online)
ijosper.uk

Original Article Received Date: 14-02-2024 Accepted Date: 01-06-2024

https://doi.org/10.5281/zenodo.12590722

The Contribution of Sufi Saints to the Propagation of Islam and Socio-Culture in Bengal: A Review in the Light of Archaeological Data

Obaidullah
Exploration Officer, Bangladesh National Museum, Shahbagh, Dhaka 1000,
oshuvoju@yahoo.com

Md.Abdul Momin
Graduate Student, Department of Archaeology, Comilla University.
abdulmomin.cou.bd@gmail.com

Mohammad Mahmudul Hasan Khan
Assistant Professor Dr., Department of Archaeology, Comilla University.
smkhanju@gmail.com

Abstract:

Centuries before the establishment of Islamic rule in Bangladesh, numerous Sufi saints and dervishes came to this land via merchants. The Sufis were spread over different parts of Bengal and devoted themselves to social service and preaching the religious message in their respective regions. The contribution of Sufis to the society and culture of ancient Bengal is still remembered in the pages of history. Various activities of Sufi saints are also found in archaeological evidence in different parts of Bengal. The present study attempts to review the history of Sufi saints' religious, social, and philanthropic activities in light of the autographs discovered in different regions of Bengal. For the research, research has been conducted by visiting the Muslim archaeological sites spread in other areas, including Gaur, Khalifatabad, Pundranagar, and Rampal, studying and reviewing the inscriptions preserved in the museum, and studying and analyzing the data from history books and literature. In the light of the Muslim inscriptions, architecture, and other archeological monuments of ancient Bengal, the present study echoes the history of the vital contribution of Sufi saints and dervishes in the propagation

of religion and various reforms and development of society and culture from the pre-Muslim period to the period of Muslim rule in Bengal.

Keywords: Sufi saints, Muslim period, Sufi contribution, Bengal, Sufism, Archaeological evidence, Inscriptions, Society and culture development

বাংলায় ইসলাম প্রচার ও সমাজ-সংস্কৃতিতে সুফি-দরবেশগণের অবদানঃ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্তের আলোকে একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই আরব বণিকদের মাধ্যমে অসংখ্য সুফি-সাধক ও দরবেশগণ বাংলার ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে শুরু করেন। বাংলায় আগমনের পর সুফিরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে সমাজসেবা এবং ধর্মীয় বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে সুফিদের অবদান আজও ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনেও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুফি সাধকদের বিভিন্ন ধরণের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বর্তমান গবেষণায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আলোকে সুফি সাধকদের ধর্মীয়, সামাজিক ও জনহিতকর কর্মকাণ্ডের ইতিহাস পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলার গৌড়, খলিফাতাবাদ, পুন্ড্রনগর এবং রামপাল সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি পরিদর্শন, জাদুঘরে সংরক্ষিত শিলালিপিগুলি অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা এবং এর উপাত্ত অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাস পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। ইতিহাস গ্রন্থ, সাহিত্য, প্রাচীন বাংলার মুসলিম শিলালিপি, স্থাপত্য ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আলোকে বর্তমান গবেষণায় ধর্ম প্রচারে এবং সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন সংস্কার ও বিকাশে সুফি সাধক ও দরবেশদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ইতিহাস প্রতিধ্বনিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্তের আলোকে বাংলার প্রাক মুসলিম সময়কাল থেকে মুসলিম শাসনামল জুড়ে ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কৃতিতে সুফি- সাধকদের অবদান পর্যালোচনা এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

মূলশব্দঃ সুফি সাধক, মুসলিম যুগ, সুফি অবদান, বাংলা, সুফিবাদ, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, শিলালিপি, সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশ

ভূমিকাঃ

বাংলায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে সমগ্র অঞ্চলে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। সমাজের প্রচলিত বর্ণ প্রথা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য তৈরি করে রেখেছিল, বিশেষত নিচু বর্ণের জনগণ ছিল সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। তবে বাংলার ভূমি প্রাকৃতিক নিয়ামতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল, ফলে এই ভূখণ্ড তৎকালে আরব ভূমি সহ ইউরোপের বণিকদের আকৃষ্ট করেছিল। এই বণিকদের মাধ্যমে অসংখ্য সুফি-সাধক ও দরবেশ বাংলায় আগমন করেছিলেন । সুফি সাধকগণ সমগ্র বাংলার বিভিন্ন প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েন এবং খানকাহ, দরগাহ স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের আবাসস্থলের বন্দোবস্ত করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই খানকা থেকেই সুফি দরবেশগণ সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামের অমিও বাণী প্রচার করতে থাকেন। পাশাপাশি সমাজের নিচু বর্ণের নির্যাতিত নিষ্পেষিত মানুষকে কাছে টেনে নেন এবং অসুস্থ ও অসহায়দের সেবা শক্রষা করা সহ অনেককেই খানকায় স্থান দেন। সুফিদের এমন জীবনাচরণ এবং মানব প্রেমে সমাজের নিচু বর্ণের মানুষেরা ইসলামী জীবনধারা এবং ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে সুফি সাধকদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীতে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম শাসকগণের প্রত্যক্ষ অনুদান, সহযোগিতা এবং সমর্থনে সমগ্র বাংলায় অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, দরগাহ নির্মাণ করা হয়েছিল। মুসলিম শাসকগণ ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের লক্ষ্যে উদ্যোমি হয়ে নিজেরাই অনেক মসজিদ মাদ্রাসার নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তবে এ সকল মসজিদ মাদ্রাসা সমূহ পরিচালনার জন্য তৎকালীন বিখ্যাত আলেম, সুফি সাধক, ও দরবেশদের দায়িত্ব দেয়া হতো। তারা শাসকদের কাছ থেকে এগুলো পরিচালনার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। এ ধরনের স্থাপনা নির্মাণের পর স্থাপনার গায়ে স্থাপনার পরিচিতি, উদ্দেশ্য, নির্মাতা, ও নির্মাণকাল সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য খোদাইকৃত শিলালিপি স্থাপন করা হতো। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা ও অধ্যায়নের জন্য তৎকালে নির্মিত এ ধরনের স্থাপত্য নিদর্শন, মুদ্রা, শিলালিপি সহ নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্তের আলোকে প্রাক মুসলিম সময়কাল থেকে মুসলিম শাসনামল জুড়ে ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কৃতিতে সুফি- সাধকদের অবদান পর্যালোচনাই এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

সুফি পরিচিতি

সুফি শব্দটি একটি আরবি শব্দ 'সুফ' (উল) থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এটি সম্ভবত প্রাথমিক মুসলিম তপস্বীদের দ্বারা পরিধান করা মোটা পশমের পোশাকের ইঙ্গিত বহন করে (হক, ২০০৬, পৃ.২৪-২৫)। তবে কোন কোন গবেষক এটির উৎপত্তিকে 'সাফা' (বিশুদ্ধতা), 'সাফ' (সারি), বা 'আসহাব-ই-সুফফা' (পবিত্র ব্যক্তিদের একটি দল) হিসেবেও আখ্যায়িত করেন (রইছউদ্দিন, ২০১৪)। ইসলামের পরিভাষায় যিনি কঠোর সাধনার ফলে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেমে নিজেকে বিলিন করে দিতে সক্ষম হয়েছেন তাকে সুফি নামে অভিহিত করা হয় (সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, প্রথম খন্ড, পৃ.৪৫২)।

সুফি থেকেই সুফিবাদ শব্দটি পরিচিতি লাভ করেছে, যা আরবীতে তাসাউউফ (আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান) নামেও পরিচিত, এই শাব্দিক পরিভাষাটি প্রাথমিকভাবে ইসলামের মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে, যার লক্ষ্য আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা। এছাড়াও তাসাউউফ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে আরো ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সুফিবাদের শাব্দিক কিংবা পারিভাষিক অর্থ শিকড়, তাসাউউফ বা সুফিবাদ যাই হোক না কেন, মৌলিকভাবে এই শব্দ দ্বারা অমর আত্মার পরিমার্জনের জন্য আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনাকে বোঝায়।

সুফিবাদে, ধ্যান 'তরিকা' বা আল্লাহর পথ হিসাবে কাজ করে, একজন 'মুর্শিদ' (আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক) এই পথে চলার জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। অগ্রগতির মধ্যে প্রথমে 'ফানাফিশ শাইখ' (শাইখের দিক নির্দেশনায় উৎসর্গ), তারপর 'ফানা ফিররাসুল' (নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসায় নিমগ্নতা), 'ফানাফিল্লাহ' (আল্লাহর প্রেমে নিজেকে মিলিয়ে ফেলা) অর্জন জড়িত। বাকাবিল্লাহ, আধ্যাত্মিক প্রাপ্তির শিখর, শুধুমাত্র 'ফানাফিল্লাহ' অর্জন করলেই পৌঁছানো যায়। একজন সূফী, 'বাকাবিল্লাহ' অর্জন করার পর, আল্লাহর ঐশ্বরিক শক্তিতে আপ্লুত হন, যা শাশ্বত শান্তি ও আনন্দের দিকে পরিচালিত করে। এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে- 'ফানাফিল্লাহ' (রবের প্রেমে নিজেকে মিলিয়ে ফেলা) মাধ্যমে, শুদ্ধ আত্মা 'বাকাবিল্লাহ' (আল্লাহর প্রেমে স্থায়িভাবে বিলীন

হয়ে যাওয়া) অর্জন করে। যেহেতু আল্লাহ দৈহিক উপলব্ধির ঊর্ধ্বে, তাই প্রেম হয়ে ওঠে মাধ্যম যার মাধ্যমে আত্মা আল্লাহর সাথে একত্রিত হয় (আল-কুরআন, ২:১৬৫)।

সুফি তরিকা

সুফি তরিকার অর্থ পথ বা রাস্তা। অনেকে একে সিলসিলাও বলেন। মূলত সুফি তরিকা বলতে বুঝায় ঈযধরহ ষরহশধমব সুফি তরিকা: সুফি তরিকার অর্থ হল রাস্তা বা পথ, তবে কেউ কেউ একে সিলসিলা বলেও আখ্যায়িত করেন। মূলত সুফি তরিকা বলতে এমন একটি নিয়ম বা শৃঙ্খলার অনুসরন বুঝায়, যার মাধ্যমে একজন সুফি তার চুড়ান্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্যর প্রতি ধাবিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আল্লাহর প্রেমে নিজেকে বিলিন করতে সক্ষম হন।

সুফিবাদের মধ্যে অসংখ্য পথ বা তরিকা রয়েছে। এসব তরিকার মধ্যে কিছু তরিকা বহু প্রাচীনকাল থেকে এখন অবধি প্রচলিত রয়েছে, কিছু তরিকার এখন আর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়না, আবার কিছু তরিকা অন্য একটি তরিকার সাথে মিলে ভিন্ন রুপ লাভ করেছে। সুফিদের এই অসংখ্য তরিকার মধ্যে ৪টি তরিকাকে প্রধান তরিকা হিসেবে গণ্য করা হয়।

১. চিশতীয়া তরিকা
২. কাদেরিয়া তরিকা
৩. নকশেবন্দিয়া তরিকা
৪. মুজাদ্দেদীয়া তরিকা

১. চিশতীয়া তরিকা : হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (র) এর নামানুসারে এ তরিকার নাম চিশতীয়া তরিকা (চিশতি, ২০২২)। এ তরিকার নামকরন করা হয়েছে হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (র) এর নামানুসারে। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (র) ৫৩৬ হিজরিতে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামি দাওয়াহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে তিনি নিজের জীবনের বাকি সময় আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করার নিয়ত করেন। তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির এবং ফিকাহ সহ তাসাউফের জ্ঞানে নিজেকে নিমজ্জিত করেন, এবং ইসলামের দাওয়াহ প্রচারের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেন। অবশেষে তিনি ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন (চিশতি, ২০২২)।

চিশতিয়া তরিকার 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ জপ করার উপর বিশেষ জোর দিতেন। তাঁরা উপাসনার সময় সমাগম করতেন এবং রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করতেন, কেউ মুরীদ হতে গেলে তাকে প্রথমে দুই রাকাত নামাজ পড়তে হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। অতঃপর মুরীদকে কতগুলো আল্লাহর নাম শিখানো হয় এবং কোন দরগায় গিয়ে ৪০ দিন সিয়াম পালনের আদেশ দেওয়া হয় (সুফিনিউজ২৪, ২০১৭)। অবশেষে তাকে তরিকার পরিচয় দেওয়া হয়। আফিং, ভাঙ্গ, তামাক, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি চিশতিয়া সুফিদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মোঘল যুগে এই তরিকার দরবেশদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ সেলিম, এরপর চিশতিয়া তরিকা কয়েকটি উপভাগে ভাগ হয়।

২. কাদেরিয়া তরিকা : কাদিরিয়া হল সুফি তরিকার একটি তপস্বী আদেশ। জনপ্রিয় এই সুফি তরিকাটি দ্বাদশ শতাব্দীতে হযরত মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) (মৃত্যু ১১৬৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (সুফিনিউজ২৪, ২০১৭)। 'দারিদ্র আমার অহংকার' রাসুল (সাঃ) এর বাণী অনুসরণ করে, ফকিররা (দরবেশ) অতিরঞ্জিত ভক্তির সবচেয়ে বেদনাদায়ক অনুশীলন অনুসরণ করে, সমস্ত জাগতিক ভোগবিলাস থেকে বিরত থাকে। এ কারণে অনেকেই আদেশকে ফকিরিও বলে থাকেন (আলী, ২০১৪)। কাদিরিয়া তরিকার অনুসারীরা উচ্চ স্বরে যিকির করে অর্থাৎ পবিত্র তিলাওয়াত করে।

আবদুল কাদের জিলানী (র.) একজন সংস্কারক ছিলেন। তার আবির্ভাবের সময়, আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল, খ্রিস্টানরা জেরুজালেম দখল করেছিল এবং গোপন হত্যা একটি ব্যাপক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। হযরত গিলানী (রঃ) একটি মাদ্রাসায় পড়াতেন

এবং নিয়মিত পাঠ ও খুতবা দিতেন। তিনি অনেক বই লিখেছেন এবং সংকলন করেছেন এবং তার মধ্যে ফতহুল রব্বানী, কাসিদা এবং ফুতুহ-উল-গাইব উল্লেখযোগ্য। ফুতুহ-আল-গাইব বাংলায় অনুবাদ করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ হাসান।

হজরত জিলানী (র.) সব সময় শরীয়তকে সব কিছুর উর্ধ্বে রাখতেন। ধ্যানের পরমানন্দে তিনি কখনও নামাজ বা বিশ্বাসের অন্য কোনো আচার-অনুষ্ঠানকে অবহেলা করেননি। এমনকি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি অসুস্থ শয্যায় থাকাকালীন অযু করে নামাজ শেষ করেন। তার মৃত্যুর দিন, ১১ই রবিউস-সানি, যা ফাতিহা-ই-ইয়াজদাহাম নামে পরিচিত (আলী, ২০১৪), বাংলাদেশে অনেকেই ধর্মীয় উৎসাহের সাথে পালন করে (সুফিনিউজ২৪, ২০১৭)।

৩. নকশেবন্দিয়া তরিকা:

নকশবন্দিয়া হল খাজা বাহাউদ্দীন ইবনে আহমদ আল বুখারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি তাসাউউফ তরীকা। নকশবন্দ শব্দের অর্থ 'চিত্রকর', এবং আদেশটি নির্দেশ করে যে সুফিরা তাদের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতিমূর্তি বহন করে তাই তাদেরকে নকশবন্দী বলা হয় (আমিন, ২০১৪) ।

নকশবন্দিয়া তরিকার আটটি স্তম্ভের উপর নির্মিত যা হল: (ক) হুশ দরদিয়া (মানসিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিঃশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ); (খ) নজর বার কদম (লোভনীয় চেহারা থেকে বিরত থাকার জন্য চোখের নিয়ন্ত্রণ); (গ) সফর দার ওয়াতান (ঘরে থাকলেও মুসাফির অনুভব করা); (ঘ) খালওয়াত দার আজুমান (দুনিয়ার বিষয়ে উদাসীন হওয়া); (ঙ) ইয়াদ করদ (নিয়ন্ত্রিত যিকরের প্রতি ভক্তি; (চ) বাজ গ'আক্সত (আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকার একটি পদ্ধতির জন্য ক্রমাগত অনুসন্ধান; (ছ) নিগাহ দ'আক্সত (আত্মরক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাকা; এবং (জ) ইয়াদ দস্ত (সর্বদা আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকা) (আমিন, ২০১৪)।

খাজা বাহাউদ্দীন উপরোক্ত আরও তিনটি উপাদান যোগ করেছেন: (ক) ওয়াকুফ-ই-জামাল্লি (নিজের সময় ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ); (খ) ওয়াকুফ-ই-কালবি (আত্ম-নিয়ন্ত্রণ); এবং (গ) ওয়াকুফ-ই-আদাদী (বিজোড় সংখ্যায় যিকর শেষ করা)। সম্রাট আকবরের শাসনামলে খাজা বাকি বিল্লাহ (মৃত্যু ১৬০৩) দ্বারা নকশবন্দিয়া তরীকা উপমহাদেশে প্রচারিত হয়েছিল। উপমহাদেশে আরও তিনটি বিখ্যাত তাসাউফ তরিকা- কাদেরিয়া, চিশতিয়া এবং সোহরাওয়ার্দিয়া আগে থেকেই ছিল।

৪. মুজাদ্দেদিয়া তরিকা: মুজাদ্দিদিয়া তরিকা হল চারটি সূফী তরিকার একটি। মুজাদ্দিদিয়া তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন শাইখ আহমদ সারহিন্দি (১৫৬৩-১৬২৪) যিনি মুজাদ্দিদে আলফে সানি অর্থাৎ 'দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক' নামে পরিচিত (হোছাইন, ২০১৪) । তিনি সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নতুন ধর্ম 'দ্বীন-ই-ইলাহী' দ্বারা ভারতের মুসলমানদের অধঃপতন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন।

শায়খ সারহিন্দী প্রবর্তিত মুজাদ্দিদিয়া তরিকাটি নকশবন্দিয়া তরিকার একটি সংস্কারকৃত সংস্করণ। চারটি তরিকার (কাদিরিয়া, চিস্তিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া) অনুসারীরা তাঁর শিষ্য হতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর এই সমস্ত তরিকার শিষ্যদেরকে গজল, কাওয়ালী ও সমাসের মতো অতীন্দ্রিয় গানের আসরে যোগ না দেওয়ার পরামর্শ দিতেন। মুজাদ্দিদ নকশাবাদিয়া তরিকাকে অন্য সব তরিকার চেয়ে পছন্দ করতেন। নকশবন্দিয়া তরিকায় শরীয়তের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলায় সুফিদের আগমনের প্রেক্ষাপট

বাংলায় ইসলাম প্রচারের মৌলিক অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল আরব বণিক এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সুফি-সাধকদের মাধ্যমে। আরবীয় মুসলিম বণিকগণ সমুদ্র পথে মালাবার, চেরর, চট্টগ্রাম-রুহমী হয়ে চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত পৌঁছেন। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে নোঙ্গর করেন এবং ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত করেন। বণিকদের পথ ধরেই অনেক ইসলাম প্রচারক, অলিয়ে কিরাম এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা অঞ্চলে সামাজিকভাবে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটে। (আখন্দ, ২০১৩, পৃ. ৩৪-৩৬)। সাধারণত আরব বণিকগণ কোথাও যাত্রা বিরতি কিংবা বাণিজ্যে গমন করলে

সেখানে তারা ইসলাম প্রচারের কাজটিও করতেন। সুতরাং বাংলায় আগমন কিংবা যাত্রা বিরতিকালেও তারা এই সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাননি। আর এভাবেই সপ্তম শতাব্দী থেকে কালক্রমে বিভিন্ন সময় আরব বণিকদের মাধ্যমে বাংলায় ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় ক্রমান্বয়ে বণিকদের পাশাপাশি বাংলার ভূখণ্ডে সুদূর আরব থেকে অগণিত সুফি-সাধক, পীর-মাশায়েখ এবং আলিম ও মোবাল্লিগদের আগমন ঘটে। ইসলাম প্রচারের স্বার্থে তারা উপকূলসহ উপকূলের আশেপাশে এমনকি সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। বৌদ্ধদের মধ্যে এই সুফি সাধকদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়। তাদের একটি বড় অংশ ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্যদিকে নিম্নবর্ণ হিন্দু ধর্মের লোকেরাও মুসলিমদের জীবন আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন (শাহনাওয়াজ, ১৯৯৯, পৃ. ১৭-১৯) ।

বাংলাদেশের সুফিবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলায় সুফিবাদের আবির্ভাব হয়েছিল একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মুসলিম ও সুফি প্রচারকদের আগমনে। মূলত এই সময়কালের বহু আগে থেকেই অল্প অল্প সংখ্যায় সুফি-দরবেশগন এই ভূখন্ডে প্রবেশ করেছিলেন। অতঃপর ১১ শতকের পরবর্তী ছয় শতাব্দী ধরে আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, খুরাসান, মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারত থেকে বাংলায় পণ্ডিত সুফি ও সাধকদের আগমন অব্যাহত ছিল (চৌধুরী, ২০০৪, পৃ: ৩৯)।

বাংলায় সুফিবাদ ছিল উত্তর ভারতের সুফিবাদের ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। বাংলার সুফিদের মতবাদ ছিল উত্তর ভারতের সুফিদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং বাংলার সুফি-সাধকদের সাথে তাদের সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত নিবিড় । সুফি ইতিহাসবিদ মোহাম্মদ এনামুল হকের মতে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, বাংলায় উত্তর ভারত থেকে সুফিদের নিয়মিত এবং ধারাবাহিক আগমনের কথা স্বীকার করা হয়েছিল এবং এই ধারাবাহিকতা ১১ শতকের শেষ অবধি অব্যাহত ছিল (হক, ১৯৭৫, পৃ: ২)।

বাংলায় সুফিদের আগমনের সময়কালের ভিত্তিতে মুহাম্মদ এনামুল হক বাংলার সুফি ইতিহাসকে নিম্নলিখিত তিনটি যুগে ভাগ করেছেন (হক, ১৯৭৫, পৃ: ১৫৪-১৫৮) ।

১. প্রারম্ভিক সময়কাল (১২ তম থেকে ১৪ শতক)
২. মধ্যযুগ (১৫ থেকে ১৭ শতক)
৩. শেষ সময়কাল (১৮ থেকে ১৯ শতক)

উত্তর ভারত থেকে বাংলায় ইসলামের প্রসারের প্রাথমিক যুগ। এই যুগের সুফিরা সবাই উত্তর ভারতের সোহরওয়ার্দী ও চিশতী সুফিদের অনুসারী ছিলেন (আব্দুল্লাহ, রব্বানী, ২০১৭, পৃ: ১০৫-১২২)। তারা ইসলামের প্রচারক হিসেবে কর্মের চেয়ে চিন্তা, ধ্যান এবং পরিদর্শনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এটি ছিল ইসলাম প্রচারের এমন একটি সময় যখন সুফিরা বাংলার জনসাধারণের মধ্যে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্রুত প্রসারে ব্যস্ত ছিলেন। বার্নার্ডর মতে এদেশের একটি বৃহৎ সংখ্যক জনগোষ্ঠী ধর্মান্তরিত হওয়ার মাধ্যমেই ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছে (আওয়ার, ১৯৯৫, পৃ: ১০)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফি-দরবেশগণ সমসাময়ীক অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে ইসলাম প্রচারণার কাজ করতেন। সুফি-দরবেশগনের এমন দাওয়াতি কার্যক্রমের ফলেই ধর্মের ক্ষেত্রে বাংলার স্থানীয় জনগণের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও অনুশীলন তখন সুফিবাদের কল্যাণে ইসলামের ছায়ায় স্থান পেতে শুরু করে।

মধ্যযুগ ছিল মুসলিম চিন্তাধারাকে দৃঢ়ভাবে একত্রীকরণ এবং বাংলায় স্থানীয় প্রভাবের ক্রমান্বয়ে ভিত্তি স্থাপনের সময়। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ সুফিদের দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং জনগণের সংস্পর্শে আসার যথেষ্ট ও উদার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। দেশের রাজনীতিতে বাঙালি সুফিদের সম্পৃক্ততা ছিল এ যুগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। দেশের জন্য যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতেও তারা সুলতানদের প্রভাবিত করত। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের অধিকাংশই ছিলেন কোন না কোন সুফির শিষ্য, এমনকি

সুলতানদের মধ্যে কয়েকজনের পারিবারিক পীরও ছিল। দেশের রাজনৈতিক প্রধানের সাথে বাঙালি সুফিদের এই ধরনের আধ্যাত্মিক সংযোগ তাদের দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত করার অনন্য সুযোগ প্রদান করেছে।

শেষ সময়কাল ছিল বাংলার সুফিদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের সময়। বাংলার মুসলমানদের সমগ্র ধর্মীয় জীবন বেশিরভাগই প্রভাবিত হয়েছিল যে পরিবেশে তারা সেই যুগে বসবাস করছিলেন। এই সময়কালে "পীর-মুরিদ" (পীরদের দ্বারা শিষ্য বানানো) প্রথাটি অনেক বেশি আলোকিত হয়েছিল এবং সুফিদের সমগ্র অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মকে এর পথ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। মুসলমানরা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, পীরের কাছে দীক্ষা নেওয়া তাদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং ফরজ; এ ধরনের বিশ্বাস ধীরে ধীরে মানুষের মনে বহু-ঈশ্বরবাদী ভক্তি ও আসক্তির জন্ম দেয় এবং তারা মৃত বা জীবিত পীরদের কাছে ভক্তিমূলক নৈবেদ্য এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ বা উপকরণ দান করতে থাকে। প্রয়াত সুফি ও সাধকদের কবরগুলি ফুল, সিঁদুর এবং অন্যান্য বস্তুর নৈবেদ্য সহ উপাসনার স্থান হিসাবে পরিণত হয়েছিল যা সাধারণত হিন্দু অনুষ্ঠান বা "পূজা" তে উপস্থিত হত। বাংলার সূফীবাদে "পীর-মুরিদ"-এর এরূপ বিচ্যুতি ও ভিন্ন রূপ এক ভয়ানক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে গড়ে ওঠে, যা তখন বাংলার হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর ভারত হয়ে বিভিন্ন সময়ে শত শত সুফি ও প্রচারক বাংলায় আগমন করেন, তাদের অনেকেই বাংলায় ইসলাম প্রচারে অবদান রেখেছেন। বাংলা অঞ্চলটি সুফিবাদের বিকাশের জন্য একটি উর্বর মাটি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। বাংলার বিশিষ্ট সুফিদের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু নতুন পদ্ধতিগত আদেশের বিকাশ ঘটে। এভাবে সুফিবাদ ইসলামের প্রসারে এবং বাংলায় মুসলিম সমাজের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রাক মুসলিম শাসনামলে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ও সুফিদের জনপ্রিয়তা অর্জন

বাংলায় ব্যাপক পরিসরে সুফি-দরবেশদের প্রভাব বিস্তার ও মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে সমগ্র বাংলা অঞ্চল প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ, অন্ত্যজ শ্রেণীর অধিবাসী এবং কিছুসংখ্যক জৈন সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ৩০)। এই অধিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেও সমাজ জীবনে তাদের তেমন মূল্যায়ন ছিল না। জৈন সম্প্রদায়ও ক্রমাগত বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও পাল বংশের পতনের কারণে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারায়। সেই সাথে বিভিন্ন দিক থেকেই তারা দুর্বল হয়ে পরে। অপরদিকে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আগমনকারী সেন বংশ গৌড়ের সিংহাসন দখল করায় ব্রাহ্মণ হিন্দুগণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা বৌদ্ধদের উপর বিভিন্নভাবে জুলুম ও নিপীড়ন শুরু করে। তাদের অত্যাচরে অতিষ্ঠ হয়ে বৌদ্ধদের একটি বড় অংশ দেশ ত্যাগ করতে শুরু করে। ফলে বৌদ্ধদের সংখ্যাও দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে (শাহনাওয়াজ, ১৯৯৯, পৃ. ২২; রহিম, ১৯৮২, পৃ. ৩০)।

মুসলিম শাসনামলের প্রাক্কালে বাংলার অধিবাসীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বাঙ্গনে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ৩০)। তৎকালে কৌলিন্য প্রথার প্রভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শুদ্র নামক বর্ণ বিভেদের প্রভাব স্বয়ং হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনকেও দুর্বিসহ করে তুলেছিল। সে সময় উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সাথে নিম্ন বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ নিষেধ ছিল। এমনকি উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য শ্রেণীর হিন্দুদের নিজ ধর্মগ্রন্থ পাঠের ক্ষেত্রেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল (উদ্দিন, ২০১০; রহিম, ১৯৮২, পৃ. ৩০৮-৩১২)। সেন আমলে চন্ডালদের অবস্থাও ছিল অত্যন্ত নাজুক। নগরে প্রবেশকালে ঘন্টাধ্বনি বাজিয়ে চন্ডালদের নগরে প্রবেশ করতে হতো। কৃষক সম্প্রদায় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জমি কর্ষণ করে ফসল উৎপাদন করত। কিন্তু তাদের ভূমির মালিক হওয়ার অধিকার ছিল না। এমনকি এ সকল বর্গাচাষীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের ন্যায্য পাওনা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বঞ্চিত এবং বৈষম্যের শিকার হতো। প্রাচীন গুপ্ত আমলেও বাংলার সাধারণ জনগণ নির্যাতিত ও অবহেলিত থাকার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। অন্যদিকে উচ্চবর্ণ হিন্দুরা ছিল সুবিধাবাদী শ্রেণী। তারা কেবল ভোগ বিলাস যৌনতা আর স্বেচ্ছাচারিতায় নিমগ্ন ছিল (উদ্দিন, ২০১০)।

তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল চরম হতাশাজনক। এ সময় কোন রাজবংশই সুসংহত রাজনৈতিক কাঠামো গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বরং তারা একে অপরের উপর অত্যাচার আর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমেই

ক্ষমতায় টিকে ছিল। সেন বংশের শাসকরা ছিল গোড়া হিন্দু। ব্রাহ্মণগণ নিম্নবর্ণ হিন্দু এবং অন্য ধর্মের প্রতি তাদের কোন সহমর্মিতা দেখাতো না। শাসক এবং ধর্মীয় গুরুদের দ্বারা সাধারণ জনগণ নিপীড়নের শিকার হতো (খান, ২০২০, পৃ;২১৩)। তারা ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণ হিন্দু, বৌদ্ধ, এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপরে এতটাই অত্যাচার করত যে, অত্যাচারিত গোষ্ঠী সব সময় সেন শাসনের পতন কামনা করতো। সেনদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে তৎকালে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ জনগণ নেপালে পালিয়ে যায়। (শাহনাওয়াজ, ১৯৯৯, পৃ. ২৩; রহিম, ১৯৮২, পৃ. ৩০)।

সমাজের এই করুণ পরিস্থিতিতে বাংলায় আগত সুফি-দরবেশগণ তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং নিপিড়িত, নিষ্পেষিত ও অবহেলিত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সমাজ সংস্করণমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনাহারিদের খাদ্য প্রদান, অসুস্থদের সেবা শশ্রুষা, সর্বস্তরের মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের জীবনাচরণ সমাজের সাধারণ মানুষের মনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করেছিল। এভাবেই সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বছর ধরে সুফী-সাধকদের কর্মকান্ডে বাংলার সাধারণ মানুষের হৃদয়ে মুসলমান ও ইসলামের প্রতি কোমলতা সৃষ্টি এবং আস্থা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছিল।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সুফি-দরবেশ

এগারো শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত দেশে সুফি-দরবেশদের কল্যাণে ইসলামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচারণা ছড়িয়ে পড়ে। আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, তুরস্ক, খোরাসান, মধ্য এশিয়া, পাকিস্তান এবং উত্তর ভারতের সুফিরা বাংলাদেশে সুফিবাদের প্রচার করেছিলেন। এই সময়কালে, সুফিদের শিক্ষা শীঘ্রই স্থানীয় জনগণের মধ্যে একটি আকর্ষণ তৈরি করতে শুরু করে। সুফিরা প্রেম, সহানুভূতি এবং সহনশীলতার উপর জোর দিয়ে বাংলার মানুষের সাথে সংযুক্ত হন। তারা তাদের শিক্ষাকে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। হযরত শাহ জালাল (১২৭১-১৩৪৬), বাংলার প্রথম দিকের অন্যতম প্রভাবশালী সুফি সাধকদের মধ্যে একজনকে মনে করা হয়। ১৪ শতকের প্রথম দিকে তুরস্কের কোনিয়া থেকে এই অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি একটি সুফি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যা এই অঞ্চলে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, যা জালালিয়া নামে পরিচিত। সেই সময়ে সূফী শিক্ষা নিয়ে আসার কৃতিত্ব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুফিরা হলেন শাহ সুলতান রুমি (মৃত্যু ১০৭৫), বাবা আদম শহীদ (১৫ শতক), শাহ সুলতান বলখী (১৪ শতক), শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুশিকান (১৪ শতক), শাহ মখদুম রূপস (১২১৬-১৩১৩), ফরিদুদ্দিন গঞ্জে শকর (১১৭৩-১২৬৫), মখদুম শাহ দোয়া শহীদ (মৃত্যু ১৩১৩), এবং অন্যান্য। তারা ইসলামী আইনশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তারা চিশতিয়া, কাদিরিয়া এবং নকশবন্দিয়্যার মতো বেশ কিছু সুফি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেগুলো বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে ওঠে। তাদের অসাধারণ জ্ঞান, বাগ্মীতা ও মানবপ্রেমের কারণে এদেশের সাধারণ মানুষ সুফিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এভাবে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে সুফিবাদের বিকাশ ঘটে। ইতিমধ্যে, উত্তর ভারতীয় সুফিবাদ মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে শক্তিশালী হয়েছিল। মূলত গঙ্গার উত্তর ভারতীয় সুফি মতবাদ বাংলাদেশে এসেছে। উত্তর ভারতীয় সুফিরা বাংলায় সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (১১৪৩-১২৩৬), খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার (১১৭৩-১২৩৫), শেখ ফরিদউদ্দীন গঞ্জে শকর (১১৭৩-১২৬৫), নিজামুদ্দিন আউলিয়া (১২৩৮-১৩২৫), শেখ শরফুদ্দিন বু আলী শাহ কালান্দর (১১৭৩-১২৩৫)। বদি'আল-দ্বীন শাহ মাদার (১৩১৫-১৪৩৪), এবং শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ-ই আলফ-ই সানি (১৫৬৪-১৬২৪)।

বাংলায় সুফি-দরবেশগণের প্রভাব

বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে পরিচিত। মূলত এই পরিচিতি বা কৃতিত্ব অর্জনের বীজ বপন করে গিয়েছেন এদেশে আগত অসংখ্য সুফি- সাধক ও দরবেশগণ। তারাই সূফীবাদের প্রসার এবং দাওয়াহের কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলায় ইসলামের প্রভাব বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশে সুফিবাদ উল্লেখযোগ্যভাবে দেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। সুফি সাধক ও পণ্ডিতরা বাংলাদেশের বিভিন্ন গোত্র-বর্ণ, ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার বহু মানুষ সুফি কর্মকাণ্ডের প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তুরস্ক, আরব দেশ, পারস্য, বাগদাদ, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলার অনেক সুফি সাধক ইসলাম প্রচার করেন। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এ দেশ সুফিদের কর্মকাণ্ডের জন্যে একটি মজবুত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এই সুফি দরবেশগণের দৈনন্দিন জীবনাচরণ ছিল অনুকরণীয় ও শিক্ষামূলক। সুফিবাদের প্রভাব বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য রূপরেখা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। সুফি-দরবেশগণের প্রভাবে তৎকালে এই ভূখণ্ডটি সুফি সম্প্রদায় ও সংগঠনগুলির জন্যে একটি সমৃদ্ধ আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছিল। ফলে তৎকালে বাংলাদেশে ষোলটি জেলার মধ্যে এগারটি জেলার নামকরণ করা হয়েছিল সুফি সাধকদের নামে।

বাংলায় আগমনকারী কতিপয় সুপরিচিত সুফি-সাধক

ক্রমিক	সুফি-দরবেশের নাম	আগমনের স্থান	সময়কাল	মাজার
১.	শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী	ময়মনসিংহ জেলার মদনপুর	১০৫৩	মদনপুর
২.	শাহ সুলতান বলখী মাহী সাওয়ার	প্রথমে ঢাকার হরিরামপুর নগর এবং পরে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে	১২-১৩ শতক	বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে
৩.	বাবা আদম শহীদ	ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার আব্দুল্লাহপুর গ্রামে	১১৫৮-৭৯	বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে
৪.	মাখদুম শাহ্ দৌলা শহীদ	পাবনা জেলার শাহজাদপুর		শাহজাদপুর
৫.	সৈয়দ নাসিরউদ্দীন শাহ্ আউলিয়া	দিনাজপুর		
৬.	হযরত খাজা ইউনুস আলী নক্‌শবন্দী মোজাদ্দাদী (রহঃ)			
৭.	জালালুদ্দীন তাবরিজী	মালদহ জেলার লাখনৌতি		
৮.	মাখদুম শাহ			
৯.	গজনবী			
১০.	বায়েজীদ বোস্তামী			চট্টগ্রাম
১১.	শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা	সোনারগাঁও	১৩০০	সোনারগাঁও
১২.	হজরত শাহাজালাল ইয়ামেনী (রহঃ)	সিলেট	১৩৪৭ ইন্তেকাল	সিলেট
১৩.	হযরত শাহ আলী বাগদাদী	ফরিদপুর	১৪৮৯	মিরপুর, ঢাকা
১৪.	হযরত শাহ্ আহসান উল্লাহ্ (রহঃ)	নারিন্দা, ঢাকা		নারিন্দা, ঢাকা
১৫.	শেখ নূর কুতুবুল আলম			পাণ্ডুয়া
১৬.	খাজা খানজাহান আলী	বাগেরহাট		বাগেরহাট
১৭.	মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক		১৮৫৯-১৯৩৯	
১৮.	দরবেশ মেহের আলী	মেহেরপুর	১৬৫৯	
১৯.	দরবেশ হযরত শাহ জামাল (রহ.)	জামালপুর		
২০.	শাহ শেখ ফরিদুদ্দিন	ফরিদপুর		
২১.	হযরত বদরুদ্দিন শাহ মাদার (রহ.)	মাদারীপুর		
২২.	মুন্সি হায়দার হোসেন	মুন্সিগঞ্জ		
২৩.	মৌলভী সৈয়দ কুদরত উল্লাহ	মৌলভীবাজার		
২৪.	হাজী শরীয়তুল্লাহ	শরীয়তপুর		
২৫.	সৈয়দ হাবীব উল্লাহ	হবিগঞ্জ		

পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকে সুফি সাধকরা বাংলায় মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া আরও অনেক সুফি সাধক বাংলায় আসেন। তারা বিভিন্ন ভাবে সমগ্র বাংলায় ইসলামের দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে থাকেন। তারা বাংলাদেশের সিলেট-চট্টগ্রাম থেকে ভারতের বর্ধমানের মঙ্গলকোট এবং দক্ষিণ বাগেরহাটের লোকদের দিনাজপুর জেলায় আমন্ত্রণ জানায়। ফলে ইসলাম প্রচারকারীদের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক মোহর আলী উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে ১০ লাখের বেশি সুফি ইসলাম প্রচার ও প্রচার করেছেন।

সুফি-দরবেশগণের প্রচেষ্টার ফলে বাংলায় ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ১৬ শতকের মধ্যে, জনসংখ্যার অধিকাংশই ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। বাঙালি সংস্কৃতিতেও সুফিবাদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। সুফিরা শ্যামা সঙ্গীত এবং কবিতা সহ বেশ কয়েকটি বাংলা শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল। ১৮শ শতাব্দীতে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় তাদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এসময় ব্রিটিশরা প্রথমে সুফিবাদের প্রতি বিদ্বেষী ছিল, তবে পরবর্তীকালে তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানাবিধ কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেছিল।

বাংলাদেশে সুফিবাদ একটি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনে রূপ লাভ করেছিল। সুফি ঐতিহ্যের সাধক ও পণ্ডিতরা বাংলার বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠীর মাঝে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করে গিয়েছেন। সমগ্র অঞ্চলে ধর্মীয় প্রচারণার পাশাপাশি শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারে সুফি-দরবেশগনের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। এছাড়াও, তারা আঞ্চলিক ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। বাংলায় সুফি-দরবেশগণের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার প্রচার ও প্রসারের দৃশ্যটি এদেশে সুফিবাদের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে সুফি-দরবেশগনের অবদান

বাংলায় সুফি-দরবেশগণ সমাজের মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের পাশাপাশি সর্বদা জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালেও এই ধারা অব্যাহত ছিল, এবং সুদৃঢ় হয়েছিল। মুসলমান শাসকগোষ্ঠি জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে নানা ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, এবং সুফি-দরবেশগণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকাহ, দরবার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। সাধারণত বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্‌রাসা, এবং খানকা সমূহ প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতায় শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকা থাকলেও এগুলো পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন বিভিন্ন গণ্যমান্য আলেম-ওলামা ও সুফি-দরবেশগণ।

সুলতানি আমলে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মসজিদ ভিত্তিক (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ. ৪০৪; ফারুক ও হুসাইন, ২০১৭, পৃ. ১)। মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করে মক্তব ও মাদরাসা গড়ে উঠেছিল, এবং এগুলো পরিচালনায় আলেম ওলামা এবং শাসকের পক্ষ হতে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হতো (রহিম, ১৯৮২, ১৬১)। মক্তবগুলোতে আরবি ও কোরআন শিক্ষা, নামাজ শিক্ষা, ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক জ্ঞান, এবং নৈতিক শিক্ষা দেয়া হতো। মক্তবের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন লিঙ্গ বৈষম্য না থাকায় ছেলে- মেয়ে উভই একসাথে পড়াশোনা করতে পারতো (ফারুক ও হুসাইন, ২০১৭, পৃ. ১)। মক্তব ভিত্তিক শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থীরা মাদরাসায় গিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেত (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ. ৪০৪)। নদীয়া বিজয়ের পর বখতিয়ার খলজি লক্ষণাবতী রাজ্যে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠাসহ ওস্তাদ ও উলামাদের সাধ্যমত সহযোগিতা করেছিলেন (সিরাজ, ১৮৮১, পৃ. ৫৫৯-৫৬০; রহিম, ১৯৮২, পৃ. ১৬২)। এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত কিছু প্রত্নস্থাপনার ধ্বংসাবশেষ থেকে জানা যায় এগুলো প্রাচীন মাদরাসার ভবন ছিল। এই অঞ্চলে ১২১২-১২২৭ পর্যন্ত গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজি একটি সরাইখানা, একটি মসজিদ, এবং একটি মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন।

তবকৎ ই নাসিরী গ্রন্থের একটি বর্ণনার আলোকে জানা যায় বখতিয়ার খলজি এবং তার আমীর-ওমরা কর্তৃক লক্ষণাবতীতে অনেক মাদরাসা নির্মিত হয়েছিল। তৎকালে ঘোড়াঘাট নামে পরিচিত বর্তমান রংপুর ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঞ্চল এবং সেখানেও

মাদরাসা স্থাপিত হয়েছিল (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ. ৪০২)। তিনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্বান ব্যক্তিদের কে সন্তোষজনক হারে বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ. ৪০২; রহিম, ১৯৮২, পৃ. ১৬২)।

রাজশাহীর চাপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলেই রয়েছে তৎকালিন মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দারাসবাড়ী মাদরাসা (ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং মসজিদের ধ্বংসাবশেষ (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ. ৪০৬)। সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ এই মাদ্‌রাসা নির্মাণের কাজ শুরু করলেও কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। ১৫০২ সালের পহেলা রমযানে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এই মাদরাসার পুনঃনির্মাণ শুরু করেছিলেন বলে মাদরাসার একটি শিলালিপিতে উল্লেখ পাওয়া যায় (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ১৬২)। গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ ১৫১০- ১৫১১ সালে কাঠিয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, এই মসজিদটি সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করত, যা মসজিদের পূর্ব প্রান্তে স্থাপিত এক শিলালিপি থেকে জানা গিয়েছে।

পান্ডুয়ায় হযরত নূর কুতুবুল আলম একটি মাদরাসা ও চিকিৎসালয় নির্মাণ করেছিলেন। এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নিষ্কর জমি দান করেছিলেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ১৩৯)। গৌড়ের ছোট সাগরদিঘির পাশেই আবিষ্কৃত আরও একটি স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ স্থানীয়ভাবে বেলবাড়ি মাদরাসা নামে পরিচিত রয়েছে (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ. ৪০৭)।

মুসলিমযুগে প্রাচীন গৌড়ের শিক্ষার খ্যাতি এতটাই প্রসন্ন হয়েছিল যে, কামরূপ রাজ্যের অনেক হিন্দু জ্ঞান অন্বেষণকারী এই অঞ্চলের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি কেউ কেউ জ্ঞান অন্বেষণের জন্য এই গৌড় রাজ্যে আগমন করেছিলেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ১৬৩)। তার মধ্যে বেদান্ত ব্রাহ্মণ অম্ভনাথ ইসলামের উচ্চতর ভাবধারায় মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ১৬৩)।

রাজধানী গৌড়ের বাইরেও সমগ্র বাংলার প্রধান প্রধান নগর ও অঞ্চলে মুসলিম শাসক, সুফি-সাধক, ও পন্ডিতের আগ্রহে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এসব শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তালিকায় রয়েছে- বর্তমান রাজশাহী জেলার 'মাহিসন্তোষ'। তৎকালে এই অঞ্চলের নাম ছিল মহীসুন, এবং বিখ্যাত পণ্ডিত মাওলানা তাকিউদ্দিন আরাবী এখানে একটি জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র পরিচালনা করতেন (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ. ৪০৭; রহিম, ১৯৮২, পৃ. ১৬৪)। ত্রয়োদশ শতকের বিখ্যাত পন্ডিত মাওলানা শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁও এসে একটি খানকা ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ১৬৪)। মাওলানা শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা ছিলেন তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের একজন অন্যতম কিংবদন্তি পন্ডিত ও মুহাদ্দিস। যিনি একাধারে কোরআন, হাদিস, ফিকহ্, দর্শন, বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ও যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ১৬৪)।

অনেক গবেষকদের ধারণা সোনারগাঁওয়ে তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ছিল উপমহাদেশে ইলমে হাদিসের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, যা বর্তমানে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য। কোরআন, হাদিস ও ধর্মিয় জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা বিষয়ে এখানে জ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে সমগ্র উপমহাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষার্থীরা ইসলামি শিক্ষার বিভিন্ন শাখা যেমন- তাফসির, হাদিস, ফিকহ এর পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, গণিত, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে আগমন করতো (ইসলাম, ২০১৭, পৃ. ১৭)।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকে (১২৯৩) সুলতান রোকনউদ্দিন রাজত্বকালে বাংলার অন্তর্গত সাতগাঁওয়ের ত্রিবেণীতে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে একটি মাদরাসার নির্মাণ করা হয়েছিল (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ. ৪০৭)। একই অঞ্চলের সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে ১৩১৩ সালে জাফর খান দারুল-খয়রাত নামে আরও একটি মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ১৬৫)। রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থ থেকে জানা যায় পশ্চিমবাংলার বীরভূম জেলার নাগরে আরো একটি শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ১৫০২ সালের একটি শিলালিপি থেকে জানা গিয়েছে সুলতান হোসেন শাহের আদেশে বর্তমান বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অন্তর্গত প্রাচীন মান্দারণে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৩১)। এছাড়াও মধ্যযুগে পান্ডুয়া ছিল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এক বিখ্যাত কেন্দ্র। (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ. ৪০৭)

হযরত নুর কুতুব আলম পান্ডুয়ায় একটি বড় মাদরাসা ও চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ৪২টি গ্রাম ও লাখেরাজ (করমুক্ত) ভূমি দান করেছিলেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৩১)। সমসাময়িক বেশ কয়েকজন সুলতান শামস আল-দিন ইলিয়াস শাহ, জালাল আল-দীন মুহাম্মদ শাহ, রুকন আল-দীন বারবাক শাহ, শামস আল-দিন ইউসুফ শাহ এবং জালাল আল-দিন ফাতহ শাহ সেখানের পণ্ডিতদের এবং শিক্ষা কার্যক্রমকে পৃষ্ঠপোষকতা

করেছিলেন (আলি, ২০০৩ই, পৃ. ৮৩৬-৮৩৭) । এছাড়াও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুঘল যুবরাজ শাহ সুজা খাজনামুক্ত জমি প্রদান করেছিলেন। এভাবেই পান্ডুয়া মধ্যযুগীয় বাংলার আধ্যাতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয় (ইসলাম,২০১৭, পৃ.১৭) ।

শেখ আতা কর্তৃক দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাজিলিস (ইলামাকি একাডেমি/ সেমিনারী) ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সমসাময়ীক বেশ কয়েকজন শাসক এই শিক্ষাকেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এর মধ্যে সুলতান শামস আল-দিন মুজাফফর শাহ সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, এবং সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সমস্ত শিলালিপিতে শেখ আতাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে শেখ আল-মাশাইখ, কুতুব আল-আউলিয়া, সিরাজ আল-হক ওয়া আল-শার ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে (আলি, ২০০৩, পৃ.৮৩৫-৮৩৬)। ৯৫০ হিজরী সন উল্লেখিত একটি শিলালিপি থেকে জানা গিয়েছে সুলতান নুসরত শাহ (১৫১৯-৩৪) বর্তমান রাজশাহী জেলার বাঘায় একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ১৬৭) ১৬০৯ সালে আব্দুল লতিফ নামক জনৈক বাংলার দেওয়ান আব্দুল হাসান এর একজন সেবক এই অঞ্চল পরিদর্শনকালে হাওদা মিয়া নামক এক প্রবীণ দরবেশকে এখানে একটি বড় মাদরাসা পরিচালনা করতে দেখেছিলেন যা এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংশাবশেষের নিদর্শন হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ১৬৭-১৬৮) ।

মুগল আমলে আজকের ঢাকা শহরটি জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত ছিল। এ সময় শিক্ষা-দীক্ষায় উজ্জ্বল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল এই জাহাঙ্গীরনগর। ঢাকার বড় কাটরা এবং ছোট কাটরার ভবনগুলো মুগল আমলে বৃহৎ মাদরাসার এলাকার মধ্যে ছিল বলে জানা যায়। এছাড়াও লালবাগ শাহী মসজিদেও একটি মাদরাসা ছিল এবং প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কোষাকার থেকে এই শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যয়বহন এবং শিক্ষকদের বেতন ভাতা প্রদান করা হতো (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৩৫)।

মুগল শাসন পরবর্তী বাংলার মুসলিম নবাবদের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ শিক্ষার সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এখানে শিক্ষার উন্নতিকল্পে মুগল সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে মুর্শিদকুলি খান একটি মাদরাসা স্থাপন করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে, এই মাদ্রাসাটি কাটারা মাদরাসা নামে পরিচিত ছিল (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৩৫)। নবাব মুর্শিদকুলি খান কলকাতায় একটি আলিয়া মাদরাসা স্থাপন করেছিলেন, পরবর্তীতে মাদরাসাটি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র ইসলামী বিষয়গুলো অধ্যয়নের ব্যবস্থা থাকলেও পরবর্তীতে পাঠ্য তালিকা সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান শুরু হয় (কুমার ও দেসাই, ১৯৭০, পৃ. ৬৫)।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার মাদরাসা শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল, ফলে তিনি তৎকালে বুদ্ধিজীবী ও আলেমদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ইংরেজি কিছু দলিল দস্তাবের অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা গিয়েছে জৈনুদ্দিন নামক আজিমাবাদের (বর্তমান পাটনা) একজন উপ শাসনকর্তা এখানে মাদরাসা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভূমি দান করেছিলেন (দত্ত, ১৯৩৯, পৃ. ২৩৮; রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৩৫)। বাংলার নবাব সুবেদারদের আমলে শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। আরবি ফার্সি ও বাংলা ভাষায় অসংখ্য বই-পুস্তক রচিত হয়েছিল। এসময় শাসকগোষ্ঠী ও অভিজাত সম্পদশালী মুসলমানগণ মাদরাসা প্রতিষ্ঠাসহ 'মাদাদ-ই- মাশ' নামক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং প্রচুর পরিমাণে নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৩৬)। এই আমলে শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা এবং পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়াও রাজনীতি, ভূগোল, দর্শন, গণিত, তর্কশাস্ত্র, এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ সব ধরনের ব্যবহারিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল সে আমলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। বাংলার শিক্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ১৮৩৫ সালের একটি প্রতিবেদনে অ্যাডাম বলেছেন, এই অঞ্চলে আরবি বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক ধরনের পাঠ্য তালিকা রয়েছে (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৩৯)। এছাড়াও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন শিক্ষা কমিশন কর্তৃক বাংলার প্রাদেশিক কমিটি রিপোর্টে উল্লেখ ছিল - এরকম একটি মসজিদ এবং ইমামবাড়া ছিল না যেখানে আরবী ও ফার্সির অধ্যাপক রাখা হতো না (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৩৭)। বাংলা ও বিহার মিলিয়ে প্রায় ১,০০,০০০ লক্ষ মক্তব ছিল (ইসলাম, ২০১৭, পৃ. ১৪)।

প্রত্নসাক্ষ্যে বাংলার সুফি-সাধকগণের ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবদানের সমর্থন

শিলালিপি

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে মুসলমান সুফি -সাধকগণের অবদান সম্পর্কে জানার অন্যতম নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হলো শিলালিপি। সমগ্র বাংলা অঞ্চল জুড়ে বহু স্থান থেকে মুসলিম শাসনামলে উৎকীর্ণ অসংখ্য শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব শিলালিপিতে সমাজ ও সংস্কৃতিতে মুসলিম শাসকদের অবদানের পাশাপাশি সুফি সাধকদেরও নানা ধরনের অবদানের তথ্য পাওয়া যায়।

বর্তমান ঢাকার বড় কাটরা স্থাপনা থেকে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই ভবনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং দরিদ্রদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাইশটি দোকান দেওয়া হয়েছিল এবং যারা সেখানে বিনামূল্যে থাকার যোগ্য তাদের কাছ থেকে কোনও ভাড়া নেওয়া হবে না। এই শিলালিপিটি বড় কাটরার প্রধান ফটকের সাথে সংযুক্ত ছিল, বর্তমানে এটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে (সাজেন, ২০২০)।

বাংলায় আবিষ্কৃত মুসলিম শাসকদের সবচেয়ে প্রাচীনতম শিলালিপিতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজির (১২১৩-১২২৭ খ্রিস্টাব্দ) নাম উল্লেখ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মখদুম শাহের দরগায় স্থাপন করার জন্য ১২২১ খ্রিস্টাব্দে এই শিলালিপিটি খোদাই করা হয়েছিল (শাহ্নাওয়াজ, ২০২১) ।

নবগ্রামের শিলালিপিগুলি সুলতান নাসির আল-দিন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রি.) এর শাসনামলে খিত্তাহ সিমলাবাদে একটি মসজিদ, একটি মাদ্রাসা সহ একসাথে শিক্ষার একাডেমি থাকার ধারণাকে সমর্থন করে (ইয়াকুব আলী, ১৯৮৫, পৃ. ৪২৩) । শিলালিপি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে মাদ্রাসাটি খিত্তাহ সিমলাবাদের প্রধান উলুগ রহিম খান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (ইসলাম, ২০১৬) ।

মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার একটি ছোট্ট মসজিদে প্রাপ্ত ১৫০২ খ্রিস্টাব্দের আলা উদ্দীন হোসেন শাহের শাসনামল্রে একটি শিলালিপি থেকে সুলতানের আদেশে একটি মাদ্রাসা নির্মাণের কথা জানা যায় (দানি, ১৯৫৮), তবে শিলালিপিটি অস্পষ্ট হওয়ার কারণে এই মাদ্রাসার অবস্থান চিহ্নিত করা যায়নি (ইসলাম, ২০১৬) ।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলির ত্রিবেণীতে অবস্থিত জাফর খান গাজীর মসজিদ ও দরগা থেকে সাতটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শিলালিপি গুলোতে জাফর খান গাজীকে জনহিতকর কাজ এবং ইমারত নির্মাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মসজিদের মেহরাবে স্থাপিত একটি শিলালিপির আলোকে জাফরখান গাজী মসজিদটি ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবি করা হয় (নস্কর, ২০২১) ।

জাফর খান গাজীর সমাধি কক্ষে স্থাপিত আরেকটি শিলালিপি থেকে জানা যায় জাফর খান গাজী ত্রিবেণীতে দারুল খয়রাত নামে একটি মাদ্রাসাও নির্মাণ করেছিলেন। এ শিলালিপিতে তাকে সাতগাঁওর শাসনকর্তা হিসেবেও সম্মোধন করা হয়েছে। এ শিলালিপিটি প্রথমে ব্লক ম্যান এবং পরবর্তীতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেছিলেন (নস্কর, ২০২১) । আবিষ্কৃত একটি শিলালিপির আলোকে বলা যেতে পারে যে মাদ্রাসাটি কাজী নাসির মুহাম্মদ ১২৯৮ সালে সুলতান রুকন আল-দিন কায়-কাউসের (১২৯১-১৩০১ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা পরবর্তীতে বিকাশ লাভ করতে থাকে (ইসলাম, ২০১৬)।

মাদ্রাসা ও দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মুসলিম সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল মাদ্রাসা। মুসলিম শাসক, সুফি-সাধক, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং জনহিতৈষী ব্যক্তিরা শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বেশ সংখ্যক মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন 'মুসলিমদের বাংলা বিজয়ের পর বখতিয়ার খলজি এবং তার উত্তরসূরি খলজি মালিকরা রাজধানী শহর লখনৌতিতে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ এবং তাদের বিজিত অঞ্চলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন (সিরাজ, ১৮৮১, পৃ. ৪২৭)। প্রথমদিকে মাদ্রাসাগুলি

মূলত একজন ব্যক্তি দ্বারা ছোট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তিতে আলেম, সুফী-সাধক এবং দরবেশগণ স্থানীয় বাসিন্দা, শাসক অভিজাত, কর্মকর্তা, ধনী ব্যক্তি, জনহিতৈষী ব্যক্তিদের কাছ থেকে আন্তরিক পরিবেশ এবং উৎসাহী সমর্থন লাভের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। কেবলমাত্র বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকেই নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এমনকি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকেও শত শত ছাত্র এই মাদ্রাসায় ভিড় জমাতো (ইসলাম, ২০১৬)।

অনেক ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক এবং লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে তথ্য পাওয়া যায় যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মাদ্রাসা ছিল। তবে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের কারণে এটি নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা কঠিন। বখতিয়ার খলজির একজন সেনাপতি গিয়াস-উদ্দীন ইওয়াজ খলজি, তার সিংহাসন আরোহণের পরপরই লখনৌতিতে একটি চমৎকার মসজিদ, একটি মাদ্রাসা এবং একটি কাফেলা নির্মাণ করেন (আইন, ১৯১৬, পৃ. ১০৬)। গৌড়ের দারাসবাড়ি একটি বড় মসজিদ, হলঘর, জামে মসজিদ সহ একটি বড় মাদ্রাসা ছিল। দরসবাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে শামস আল-দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.) এর শাসনামলের আবিষ্কৃত শিলালিপিটি সমর্থন করে যে একটি জামে মসজিদ ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের পূর্ব দিকে কয়েক গজ দূরে আরেকটি কাঠামোগত স্থান ছিল। নবগ্রাম শিলালিপিগুলি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ মাদ্রাসা থাকার ধারণাকে সমর্থন করে। শিলালিপির আলোকে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রি.) শাসনামলে খিত্তাহ সিমলাবাদে একটি মসজিদের সাথে মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকার তথ্য অনুমান করা যেতে পারে (ইয়াকুব আলী, ১৯৮৫, পৃ. ৪২৩)। শিলালিপির ভাষ্যমতে এ মাদ্রাসাটি খিত্তাহ সিমলাবাদের প্রধান উলুগ রহিম খানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (ইসলাম, ২০১৬) ।

দারাসবাড়ি মাদ্রাসাঃ মাদ্রাসা কমপ্লেক্সের স্থাপত্যিক গঠন অনেকটা প্রাকমুসলিম সময়কালের বৌদ্ধ বিহারগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। শিলালিপি অনুসারে মাদ্রাসাটি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ৯০৯ হিজরিতে (১৫০৪ খ্রি.) নির্মাণ করেন বলে জানা গিয়েছে (হোসেন, ২০১৫) । সুলতান আলা উদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) এর সময়কার ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত অন্য একটি শিলালিপির প্রমাণের ভিত্তিতে এটিকে মাদ্‌রাসা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (ঔঅঝই, ১৯৭৯- ৮১)। ধর্ম, বিজ্ঞান, এবং নীতির শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে এই মাদ্রাসাটি নির্মান করা হয়েছিল (আলি, ২০০৩, পৃ ৮৩০)। অনুমান করা যেতে পারে যে শামস আল-দ্বীন ইউসুফ শাহ দারাসবাড়িতে একটি জামে' মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ শুরু করেছিলেন, জামে মসজিদটি ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়েছিল, এবং মাদ্রাসা ভবনটি শেষ পর্যন্ত আলা'আল-দীন হুসেন শাহের শাসনামলে শেষ হয়েছিল ১৫০২-০৪ খ্রিস্টাব্দে (ইয়াকুব আলী, ১৯৮৫, পৃ. ৪২৩)।

ধর্মীয় কাজ ও স্থাপত্য শিল্পে সুফি সাধকদের অবদানের স্বাক্ষর

বাংলায় যে সকল সুফি সাধক ও দরবেশ গুণের আগমন ঘটেছে, তারা সমাজের প্রয়োজনের সমগ্র বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলেন। তারা ধর্মীয় ও সমাজ সেবার প্রয়োজনে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান অঞ্চলে মসজিদ, খানকাহ, দরগাহ প্রভৃতি জাতীয় স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে নিজেদের আস্তানা গড়ে তুলেছিলেন। তৎকালে মুসলিম শাসকগণও অনেক বিখ্যাত সুফি সাধকদের সম্মানার্থে তাদের প্রয়োজনে মসজিদ-মাদ্রাসা সহ বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করে দিতেন। তবে ওই সুফি সাধক ও দরবেশগণই তাদের নিয়মে এই প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিচালনা করতেন, এবং প্রয়োজনে শাসকদের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রাপ্ত হতেন। সমগ্র বাংলা অঞ্চলে এখনো মুসলিম শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, দরগাহ, তোরণ, স্তম্ভ, পুকুর ঘাট প্রভৃতি স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ টিকে রয়েছে।

ষাট গম্বুজ মসজিদঃ পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়কালে খান জাহান আলী নামে একজন সুফি বাগেরহাট জেলার উপকূলের কাছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনে সাধারণ একটি মুসলিম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের

শাসনামলে খলিফালাবাদ শহরে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। খান জাহান এই শহরটিকে এক ডজনেরও বেশি মসজিদ দিয়ে সাজিয়েছিলেন, যার ধ্বংসাবশেষগুলি এখনো টিকে রয়েছে। বাংলাদেশের একটি মসজিদ সুলতানী যুগের অনন্য নিদর্শন ষাট গম্বুজ মসজিদ। এটি সুলতানি আমল (১২০৪-১৫৭৬) থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তম মসজিদ। মসজিদটির নির্মাণ কাজ ১৪৪২ সালে শুরু হয় এবং এটি ১৪৫৯ সালে শেষ হয়। মসজিদটি নামাজের জন্য এবং একটি মাদ্রাসা ও সমাবেশ হল হিসেবেও ব্যবহৃত হত। পুরো ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মুসলিম স্মৃতিস্তম্ভগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

আলোকচিত্রঃ ০১; ষাট গম্বুজ মসজিদ, ছবি কৃতজ্ঞতাঃ মো.জায়েদ।

দরাসবাড়ি মসজিদঃ দরাসবাড়ি মসজিদ গৌড়-লখনৌতির বাংলাদেশ অংশের বৃহত্তম মসজিদ, বর্তমানে ধ্বংসাবশেষ। মসজিদটির শিলালিপি অনুসারে শামসুদ্দিন আবুল মুজাফফর ইউসুফ শাহ ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন (হোসেন, ১৯৯৭)। মসজিদের শিলালিপিটি বর্তমানে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এটি ছোট সোনা-কোতোয়ালি দরওয়াজা রোডের পশ্চিম পাশে মধ্যযুগীয় শহরের দারাসবাড়ি কোয়ার্টারে অবস্থিত, বর্তমানে ভারতীয় সীমান্তের কাছে একটি জনশূন্য এলাকা। দরসবাড়ি নামটি একটি দরসবাড়ি (পাঠ বা শেখার স্থান) এর মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় এটির উৎপত্তি হয়েছে, মসজিদের পূর্ব দিকে মাদ্রাসাকে কমপ্লেক্স রয়েছে।

বড় সোনা মসজিদঃ বাংলার সালতানাতের রাজধানী গৌড়-লখনৌতির বৃহত্তম মসজিদ এবং এটি বাংলায় সুলতানি স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন বড় সোনা মসজিদ। গত শতাব্দীর শুরুর দিকে মেজর ফ্র্যাঙ্কলিন মসজিদের কাছে একটি ৯৩২ হিজরি (১৫২৬

খ্রিস্টাব্দ) তারিখের শিলালিপি আবিষ্কার করেন। লিপির তথ্য অনুসারে এটিকে মসজিদ হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং সুলতান নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। মসজিদের ঠিক বাইরে উত্তর-পশ্চিম কোণে ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত আরেকটি শিলালিপিতে ৯৩২ এপ্রিল অর্থাৎ ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ রয়েছে। ফলে মসজিদের নির্মাণকালের সঠিক তথ্য নিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে।

দুটি শিলালিপির বিষয়বস্তু থেকে অনুমান করা যায় যে মসজিদটি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলের শেষদিকে নির্মিত হয়েছিল। তিনি রামকেলির কাছে মূল শহরের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে বুজুর্গ হুসাইনাবাদ নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল। নগরটি অসম্পূর্ণ ছিল এবং বর্তমানে তা বিলুপ্ত। তবে এই মসজিদকে সেই নগরের একমাত্র নিদর্শন বলে ধারণা করা হয় (হোসেন, ২০১৫)।

ছোট সোনা মসজিদঃ ছোট সোনা মসজিদকে মাঝে মাঝে সুলতানি স্থাপত্যের রত্ন হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কেন্দ্রীয় দরজার উপরে একটি শিলালিপির ফলক এখনও স্থির রয়েছে যে মসজিদটি মজলিস-আল-মাজালিস, মজলিস মনসুর ওয়ালি মুহাম্মদ বিন আলী দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। শিলালিপিতে আরবি হরফ, যা নির্মাণের সঠিক তারিখ দিয়েছিল, মুছে ফেলা হয়েছে। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের নাম (যেমন লেখা আছে... ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষক, সুলতান আলা আল-দুনিয়া ওয়াল-দিন) তার শাসনামলে ১৪৯৩ -১৫১৯ খ্রি. (৮৯৯-৯২৫ হিজরি) কোনো এক সময় মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল (হোসেন, ২০১৪)।

তাহখানাঃ তাহখানা, একটি ফার্সি শব্দ যা একটি আরামদায়ক শীতল ভবন বা প্রাসাদকে বোঝানো হয়, গৌড়-লখনৌতির ফিরোজপুর এলাকার মধ্যে একটি বিশাল পুকুরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ঐতিহ্যগতভাবে তাহখানা নামে স্বীকৃত ভবনটির উত্তর-পশ্চিমে দুটি অতিরিক্ত কাঠামো রয়েছে: এর কাছাকাছি একটি তিন গম্বুজ মসজিদ এবং আরও উত্তরে একটি খিলানযুক্ত বারান্দা সহ একটি গম্বুজ বিশিষ্ট সমাধি। ধারণা করা হয় স্থাপনা দুটি সমসাময়িক সময়কালের মধ্যেই নির্মিত হয়েছে, কেননা উভয় স্থাপনার স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। যদিও সেগুলি এখন ধ্বংসস্তূপে পড়ে আছে।

এই কমপ্লেক্সের নির্মাতা ও নির্মানকালে সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, মুঘল ও সালতানাত শৈলীর সংমিশ্রণ এবং ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে ধারণা করা হয় যে এটি মুঘল সুবাহদার শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি.) নির্মাণ করেছিলেন। শাহ সুজা, যিনি সুফি সাধক শাহ নিয়ামতুল্লাহ ওয়ালীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ঘন ঘন গৌড়-লখনৌতি আগমন করতেন, সম্ভবত তাঁর সফরের সময় প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন।তবে প্রায়ই গৌড়ে তার ভ্রমণ এবং সেখানে অবস্থিত লুকোচুরি দরওয়াজা নামে জাকজমকপূর্ণ মোঘল তোরণ এ যুক্তিটিকে আরও বেশি অকাট্য করে তুলেছে। খুব সম্ভবত শাহ সুজা দরবেশের খানকাহ হিসেবে এই ছোট্ট প্রাসাদটি এবং এর সংলগ্ন মসজিদ ও সমাধিসৌধটি নির্মাণ করেন। সমাধিটি সম্ভবত দরবেশের (মৃত্যু ১৬৬৪ অথবা ১৬৬৯ খ্রিঃ) দাফনের জন্য পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল।

মাজার ও সমাধিতে সুফি-সাধকগণের স্মৃতিঃ

শাহ সুলতান বলখী মাহিসাওয়ারের মাজারঃ মহাস্থানগড়ের একটি বিশেষ স্থান শাহ সুলতান বলখী মাহিসাওয়ারের মাজার বা সমাধি (পবিত্র সমাধি) (একজন জনপ্রিয় কিংবদন্তি অনুসারে একজন দরবেশ যিনি মাছের আকৃতির নৌকায় চড়ে এই গড়ের (দুর্গ) উপরে এসেছিলেন (করিম, ২০১৫)। বুড়ি কা দরওয়াজা নামের প্রবেশদ্বার দিয়ে দর্শনার্থীরা একটি অনিয়মিত সিঁড়ি দিয়ে দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উঁচু ঢিবির চূড়ায় যেতে পারেন। সমাধির সাথে ঢিবিটিতে একটি মসজিদ এবং বেশ কয়েকটি কবর রয়েছে।

কবরগুলির মধ্যে একটি হরপালের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তথাকথিত রাজা পরশুরামের তথাকথিত ঝাড়ুদার যিনি স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারে রাজা পরশুরামের পতন ঘটাতে সাধু শাহ সুলতান মাহিসাওয়ার বলখীর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। সাধক শাহ সুলতান

মাহিসাওয়ার বলখী ছিলেন রাজকীয় বংশের একজন দরবেশ যিনি পীর তৌফিকের নির্দেশে বাংলায় অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য মহাস্থানগড় এলাকায় এসেছিলেন (করিম, ২০১৫)।

শাহ সুলতান রুমি (রঃ) মাজারঃ শাহ সুলতান রুমি (রঃ) একজন সুফি, যার দরগাহ নেত্রকোনা জেলার মদনপুরে। বাংলায় তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ড প্রায় একশত বছর আগে এলাকা থেকে সংগৃহীত ঐতিহ্যের বিষয়বস্তু। প্রথা অনুযায়ী, নেত্রকোনা এলাকায় একজন কোচ রাজা রাজত্ব করছিলেন, তখন সাধক এসে সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

সেখানে সাধক ও তার অনুসারী ছাড়া আর কোন মুসলমান ছিল না, কিন্তু সাধক যখন সেখানে বসতি স্থাপন করেন তখন তিনি তার তাকওয়া দ্বারা বহু মানুষকে আকৃষ্ট করেন। কথিত আছে যে, যে তার সংস্পর্শে এসেছে সে তার অলৌকিকতার দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং একজন একনিষ্ঠ অনুসারী হয়েছে। ঘটনাটি রাজার নজরে এলে তিনি দরবেশকে তার উপস্থিতিতে ডেকে তার কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করতে বলেন। সাধু বলেছিলেন যে ঈশ্বর তাকে আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়েছেন। রাজা দরবেশকে বিষ পরিবেশন করার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তীতে বিসমিল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহর নামে) উচ্চারণ করে বাদশাহ তার বড় আশ্চর্যের মধ্যে দেখতে পান যে দরবেশ নিরাপদ এবং বিপদমুক্ত। উপস্থিত লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাজা দরবেশকে মদনপুর গ্রাম বিনা করমুক্তভাবে প্রদান করেন (করিম, ২০১৫)।

মদনপুরের মাজারের সাথে একটি বড় খাজনাবিহীন এস্টেট সংযুক্ত রয়েছে। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার এস্টেটটি পুনরায় চালু করার চেষ্টা করে, তখন মন্দিরের অভিভাবকরা ১০৮২ হি/১৬৭১ খ্রিস্টাব্দের একটি পুরানো ফার্সি নথি তৈরি করেন এবং মদনপুর এস্টেটটি নথির ধারকদের কাছে নিশ্চিত করা হয়। প্রতীয়মান হয় যে, শাহ সুলতান রুমি সেই সব সাধকদের মধ্যে একজন যারা বাংলায় এসেছিলেন। কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে তিনি বাংলা বিজয়ের পূর্বে মদনপুরে এসেছিলেন, যা অবশ্য সত্য নাও হতে পারে।

বাবা আদম শহীদ মসজিদ ও মাজারঃ বাবা আদম শহীদ হলেন একজন সাধক যিনি রামপাল (মুন্সিগঞ্জ জেলা) থেকে কিছুটা দূরে বিক্রমপুরার একটি গ্রামের আব্দুল্লাপুরে একটি পুরানো মসজিদের আঙ্গিনায় সমাহিত। মসজিদের সাথে সংযুক্ত একটি আরবি শিলালিপি সুলতান জালালুদ্দিন ফতহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৭) এর একজন কর্মকর্তা মালিক কাফুর দ্বারা এটির নির্মাণ করেছেন বলে জানা যায় । শিলালিপিতে বাবা আদম শহীদের কোনো উল্লেখ নেই, বা অন্য কোনো সূত্রে সাধু সম্পর্কে কোনো প্রামাণিক তথ্য নেই।

তবে স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী বাবা আদম শহীদ একজন ফকির বা সাধক হিসেবে মক্কায় বসবাস করছিলেন। সেই সময় রামপালের নিকটবর্তী গ্রামের কানা-চ্যাং-এর একজন নির্দিষ্ট মুসলমান স্থানীয় শাসক বল্লালসেনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাবা আদমের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। ঐতিহ্য আছে যে তিনি তার পুত্রের জন্ম উদযাপনের জন্য একটি গরু বলি দিয়েছিলেন যার জন্য তিনি স্থানীয় হিন্দু রাজার দ্বারা নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। হতভাগ্য মুসলিম দেশ থেকে পালিয়ে মক্কায় চলে যান যেখানে তিনি বাবা আদম শহীদের কাছে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বর্ণনা করেন। একজন সহ-ধর্মবাদীর দুর্দশার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সাধক ছয় থেকে সাত হাজার অনুসারী নিয়ে তাঁর সাহায্যে আসেন। রাজা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করার সংকল্প করলেন এবং তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হলেন। সেনাবাহিনী মুসলমানদের বিতাড়িত করতে ব্যর্থ হলে রাজা নিজেই মাঠে নেমেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই সুফিকে হত্যা করা হয়, কিন্তু ভাগ্যের কৌতূহলী আঘাতে, রাজা নিজে এবং তার পরিবার অগ্নিকুণ্ড বা আগুনের গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাণ হারান।

সত্য বা মিথ্যা, এই ঐতিহ্যই বাবা আদম শহীদের ইতিহাস পুনর্গঠনের একমাত্র উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৩ শতকের গোড়ার দিকে বখতিয়ার খলজির অধীনে তুর্কি বিজয়ের অনেক আগে থেকেই আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বাংলার সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে আরব যোগাযোগ রামপালের মতো অভ্যন্তরীণ জায়গায় মুসলিম বসতি স্থাপন করতে পারে কিনা সন্দেহ। তবে সম্ভবত, দরবেশের তারিখটি মালিক কাফুরের মসজিদের পূর্ববর্তী ছিল। দরবেশের কবরের চারপাশে যখন একটি মুসলিম বসতি বৃদ্ধি পায়, তখন সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল।

পূর্বে, পণ্ডিতরা মনে করতেন যে বাবা আদম শহীদ সেই সুফিদের মধ্যে একজন যারা তুর্কি বিজয়ের আগে বাংলায় এসেছিলেন। কিন্তু তুর্কি বিজয়ের আগে বাংলায় কোন সুফি সাধকের আগমন সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো প্রামাণিক নিশ্চিতকরণ নেই। বাবা আদমের তারিখ ১৪ শতকের শেষের দিকে নির্ধারিত হতে পারে।

আলোকচিত্রঃ ০২; বাবা আদম শহীদ মসজিদ, ছবিঃ সংগৃহীত।

শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা মাদ্‌রাসা ও মাজারঃ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা একজন বহুমুখী পণ্ডিত, সুফি সাধক এবং ইসলাম ধর্মগুরু। বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং খুরাসানে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইসলামি শিক্ষার সকল বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন এবং রসায়ন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং জাদুবিদ্যার মতো ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও ভারতে তিনি তাঁর ধার্মিকতা ও শিক্ষার জন্য সুনাম অর্জন করেছিলেন। আবু তাওওয়ামা ৭০০ হিজরিতে (১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) সোনারগাঁয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মোগরাপাড়ার দরগাবাড়ি চত্বরে কবরস্থানে তার সমাধি রয়েছে। বর্তমান দরগাবাড়িটি তার খানকা ও মাদ্রাসার স্থানের প্রতিনিধিত্ব করে।

মাওলানা আবু তাওওয়ামা ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে বা প্রায় ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে আসেন, প্রায় দশ বছর তাঁর পাঠদানের কোর্স চালিয়ে যান এবং তারপরে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের অনুরোধে তাঁর ভাই মাওলানা হাফিজ জয়নুদ্দীনের সাথে তাঁর পরিবারসহ সোনারগাঁয়ে আসেন সম্ভবত ১২৭০ খ্রিস্টাব্দে (৬৬৮ হিজরী)। তিনি সোনারগাঁয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে তার খানকা ও একটি মাদ্রাসা গড়ে তোলেন। তাফসির, হাদিস, ফিকাহ এবং ইসলামিক শিক্ষার অন্যান্য শাখার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানের মতো ধর্মীয় বিষয়গুলি যুগের এই বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তির অধীনে শেখানো এবং অধ্যয়ন করা হয়েছিল। এটি সোনারগাঁওকে শুধুমাত্র বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে বিখ্যাত শিক্ষার একটি অ্যানিমেটেড কেন্দ্রে পরিণত করেছে। বিহারের বিখ্যাত সুফি পণ্ডিত, মখদুম-আল-মুলক শায়খ শরফুদ্দিন আহমদ বিন ইয়াহিয়া মানেরি ২২ বছর ধরে সোনারগাঁও মাদ্রাসায় আবু তাওয়ামার অধীনে অধ্যয়ন করেছিলেন।

আবু তাওওয়ামা তাসাউফ (ইসলামিক রহস্যবাদ) এর উপর মাকামত নামে একটি মূল্যবান বই সংকলন করেছেন। কাজটি তার ধরণের একটি অনন্য ছিল, তবে এটি উত্তরোত্তর পর্যায়ে আসেনি। নাম-ই-হক নামে ফারসি আয়াতে রচিত ফিকহ (ইসলামিক আইনশাস্ত্র) সম্পর্কিত আরেকটি বই আবু তাওওয়ামার লেখককে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। বইটিতে লেখকের নাম বা কোথায় লেখা হয়েছে তা নিশ্চিত করার মতো কিছুই পাওয়া যায় না। বইটিতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয় যে এটি আবু তাওয়ামা না লিখলেও, বাংলায় তাঁর একজন শিষ্য তাঁর শিক্ষার ভিত্তিতে এই রচনাটি সংকলন করেছিলেন, সম্ভবত ৭০৪ হিজরিতে (১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে), শায়খের মৃত্যুর পর। . নাম-ই-হক ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে এবং নবী (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুসরণ করে তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুসলমানদের জন্য একটি পথপ্রদর্শক হওয়ার উদ্দেশ্য। বইটিতে ১৮০টি শ্লোক রয়েছে। এটি প্রথম ১৮৮৫ সালে বোম্বেতে এবং পরবর্তীতে ১৯১৩ সালে কানপুরে প্রকাশিত হয়েছিল। শাহ শুহাইব, একজন সমসাময়িক পণ্ডিত, তার মানাক্কিবুল আ'সফিয়া গ্রন্থে আবু তাওয়ামার প্রচুর প্রশংসা করেছেন।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধিঃ গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধি বাংলাদেশের সুলতানি আমলের প্রাচীনতম বিদ্যমান কাঠামো। এটি সোনারগাঁয়ের শাহচিলাপুরে একটি পাথরের কবর এবং এটি বাংলার তৃতীয় ইলিয়াস শাহী শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের বলে পরিচিত।

যদিও এই সমাধিতে সমাহিত ব্যক্তির পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। স্থানীয় জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে আহমেদ হাসান দানি এটিকে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহকে দাবি করেছেন। তবে বুকানন মন্তব্য করেছেন যে তাকে হযরত পান্ডুয়ার একলাখি সমাধিতে সমাহিত করা হয়েছিল। সাহিত্য প্রমানের আলোকে জানা যায় যে সুলতান সিকান্দার শাহ সোনারগাঁও থেকে প্রায় ২০ মাইল পশ্চিমে সুনগরের কাছে তার পুত্র গিয়াসউদ্দিনের সাথে লড়াইয়ের সময় মারা যান। জায়গাটি পুরান ঢাকা জেলার মৌজা জাফরাবাদের মধ্যে আধুনিক সোঙ্গার ও কাটাসুরের কাছে হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

সমাধিতে কোন শিলালিপি নেই, তবে আদিনা মসজিদের আলংকারিক নকশা অনুলিপি করার জন্য এটিই প্রাচীনতম স্মৃতিস্তম্ভ বলে মনে হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে, এটি ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সমাধি। কাজেই সৌধটিকে পনেরো শতকের প্রথম দিকে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিনের শাসনকালের বলে ধরে নেওয়া যায়। স্থাপত্যগতভাবে, স্মৃতিস্তম্ভটি এই সুলতানের আমলের অন্তর্গত কারণ এটি তার পিতা সিকান্দার শাহ কর্তৃক নির্মিত আদিনা মসজিদের আলংকারিক শৈলীরণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

খানকাহঃ সুফিদের খানকাহ সমূহ শিক্ষাকেন্দ্রর ভূমিকা পালন করতো, যেখানে সুফিগণ জীবনযাপন করেন এবং তার অনুসারীদের বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রদান করেন। খানকাহগুলো একটি একাডেমিক কেন্দ্র এবং একটি ত্রাণ শিবির হিসাবেও কাজ করতো, যেখানে অসহায় এবং নিঃস্বদের দেখাশোনা করা হতো। মাওলানা হামিদ দানিশমান্দ জ্ঞানার্জনের জন্য বোহারে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে এখানে এসেছিল (ব্যানার্জী, ১৩২১)।

বাংলায় মুসলিম শাসনামল শুরুর পূর্ব থেকেই এদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত শায়খ ও সুফিদের খানকাহ মুসলমানদের পথপ্রদর্শন এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

আলোকচিত্রঃ ০৩; চেহেলগাজী মসজিদের ধবংসাবশেষ ও এর সংলগ্ন মাজার, দেবীগঞ্জ, দিনাজপুর, ছবি কৃতজ্ঞতাঃ সংগৃহীত।

লখনৌতিকে বাংলার রাজধানী করার পর মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেছিলেন বলে মিনহাজ-ই-সিরাজে উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রথম একশ বছরের (১২০৪-১৩০৪) তেরোটি শিলালিপি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে; তাদের মধ্যে ছয়টি খানকাহের সাক্ষ্য বহন করে। এটি তৎকালীন বাংলার সমাজে খানকার গুরুত্ব নির্দেশ করে। দেবকোট, দেওতলা, রাজস্থান, ঢাকা, সোনার গাঁও, চট্টগ্রাম, সিলেট, গৌড়, পান্ডুয়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ এবং ত্রিবেণীর মতো স্থানগুলি খানকাহর জন্য বিখ্যাত ছিল (ওয়াইজ, ২০১৪)।

উপসংহার

বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা যখন এক করুণ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, মানুষের সামাজিক অধিকার, নৈতিকতা, এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ বলতে তেমন কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। এমনই এক মুহূর্তে সুফি সাধকগণ এই ভূখণ্ডের মানুষের দুয়ারে একেক জন আলোকবর্তিকা হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন । মানুষকে জীবের প্রতি প্রেম শিখিয়েছিলেন, আল্লাহ ও রাসূলের পথপ্রদর্শন করেছিলেন এবং এরই মাধ্যমে অন্ধকার থেকে সমাজকে আলোর দিকে টেনে তুলেছিলেন। তারা নওমুসলিমদের ধর্মীয় নীতিতে শিক্ষিত করেছিলেন, দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করেছিলেন, স্থানীয় লোকদের আকৃষ্ট করেছিলেন, তাদেরকে ইললামের ছায়াতলে আগমনের জন্যে দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন এবং পথ তৈরি করেছিলেন। আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সুফিদের মহৎ চরিত্র স্থানীয় মানুষের মন জয় করেছিল। এদেশে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও সার্বজনীন ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুফিরা সহনশীলতার এক নতুন চেতনায় প্রবেশ করেছিল। সমাজ সংস্কার এবং উন্নয়নের মূল মন্ত্র হিসেবে সুফি সাধক এবং তৎকালীন আলিমরা শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারে ব্যাপক জোর দিয়েছিলেন। মাদ্রাসাগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় অধ্যায়ন চালু করেছিলেন। ফলে সমগ্র বাংলার বিভিন্ন প্রান্তরে একে একে নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, দরগাহ, ইবাদত খানা সহ নানা ধর্মীয় স্থাপনা। ধর্মীয় বিষয়গুলোতেও জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক ইবাদত এবং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দৃঢ় ঈমানের চর্চাও অব্যাহত রেখেছিলেন। সুফিদের খানকাসমূহ হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের এক একটি কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। ধর্মীয় সেবার পাশাপাশি সমাজের মানুষের প্রয়োজনে সুফিগণ নিজেদের প্রচেষ্টা এবং কখনো কখনো শাসকদের সহযোগিতায় স্থানীয় জনসেবার প্রয়োজনে লঙ্গরখানা, রাস্তাঘাট, পুল, পুকুর, জলধার প্রভৃতি নির্মাণ করেছেন। তৎকালীন সুফি সাধক ও আলিমগণের এমন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডের অবদানে জনসাধারণ থেকে শাসকবর্গ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সুফিবাদের মাহাত্ম্য ও ব্যাপকতা শীর্ষস্থানে পৌঁছেছিল।

গ্রন্থ সহায়ীকা

Ali, M.M. (2021) *Qadiriah, Banglapedia*. Available at: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Qadiriah (Accessed: 15 Mar 2024).

Amin, M.R. (2021) *Nakshbandia, Banglapedia*. Available at: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Nakshbandia (Accessed: 15 Mar 2024).

Ali, Muhammad Mohar (2003b). *History of the Muslim Bengal*. Vol-I B, Survey of Administration, Society and Culture, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1207.

Ali, A. K. M. Y. (1985). Education for Muslims under the Bengal Sultanate. Islamic Studies (Vol. XXVI). Islamic Research Institute.

Ahmad, S. (1960). *Inscriptions of Bengal* (Vol. IV). Varendra Research Museum.

Aquil, R. (2011). *Sufism and society in medieval India*. Oxford University Press.

Islam, Md. T. (n.d.). *An outline of educational system in Muslim bengal under the Turko-Afghan sultanate (1204-1576)*. International Journal of Islamic Thoughts. https://ijits.net/ojs3/index.php/ijits/article/view/84

Siddiq, M. Y. (2012). Epigraphy and Islamic history in South Asia. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *02*(02), 01–34. https://doi.org/10.32350/jitc.22.01

Göktaş, V., & Chowdury, S. R. (2023). Districts of Bangladesh named after Sufis manifesting the great impact of Sufism on Bengal civilization: A qualitative study. *Journal of Islamic Thought and Civilization, 13*(1). https://doi.org/10.32350/jitc.131.22

Al Masud, A., Abdullah, Md. F., & Amin, Md. R. (2017). The contributions of Sufism in promoting religious harmony in Bangladesh. *Journal of Usuluddin*, *45*(2), 105–122. https://doi.org/10.22452/usuluddin.vol45no2.5

Halim, W. (n.d.). *The Sufi sheikhs and their socio-cultural roles in the islamization of bengal during the Mughal period (1526-1858)*. JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jicsa/article/view/7045

Haq, Muhammad Enamul (1975). *A history of Sufism in Bengal*. Dhaka: Asiatic Society of Bengal.

Islam, M. T. (n.d.). Educational system developed in Muslim Bengal under the Turko-Afghan Sultanate (1204-1576), *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, Center for University Requirement Courses (CENURC), International Islamic University Chittagong (IIUC).

Karim, A., (1960). *Corpus of the Muslim coins of Bengal*. Asiatic Society of Pakistan.

Karim, A., (1964). *Dacca The Mughal Capital*. Dacca: Asiatic Press

Karim, A., (1987). *Banglar Itihas: Sultani Amal*, (in Bangla), 2nd ed, Dhaka.

Rahim, A. (1963). Social and cultural history of Bengal (Vol. 1). Pakistan Historical Society.

Rahim, M. A. (1966). Social and cultural history of Bengal (1557-1857) (Vol. 2). Pakistan Historical Society.

Roy, S. (2021, May 17). জাফর খাঁ গাজী ও ত্রিবেণীতে তার মসজিদের ইতিহাস. সংশয় - চিন্তার মুক্তির আন্দোলন. https://www.shongshoy.com/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%81-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%A4/

Shanawaz, AKM. (2021, June 17). *Inscriptions*. Banglapedia. https://en.banglapedia.org/index.php?title=Inscriptions

Dey, S.K. (2021) *Anjuman-i-wazin-i-bangla*, *Banglapedia*. Available at: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Anjuman-i-Wazin-i-Bangla (Accessed: 22 May 2024).

Enamul, M. (1975) *A history of Sufi-ism in Bengal*. S.l.: Asiatic Society of Bangladesh.

Hossain, A.M. (2021) *Mujaddidiya Tariqa*, *Banglapedia*. Available at: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Mujaddidiya_Tariqa (Accessed: 16 Apr 2024).

Husain, A. (2021a) *Bara Sona Mosque*, *Banglapedia*. Available at: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Bara_Sona_Mosque (Accessed: 12 May 2024).

Husain, A. (2021b) *Chhota Sona Mosque*, *Banglapedia*. Available at: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Chhota_Sona_Mosque (Accessed: 02 Apr 2024).

Husain, A. (2021c) *Darasbari Mosque*, *Banglapedia*. Available at: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Darasbari_Mosque (Accessed: 24 Apr 2024).

Karim, A. (2021a) *Makhdum Shah (R)*, *Banglapedia*. Available at: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Makhdum_Shah_%28R%29 (Accessed: 22 Mar 2024).

Karim, A. (2021b) *Nur Qutb Alam*, *Banglapedia*. Available at: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Nur_Qutb_Alam (Accessed: 27 Apr 2024).

Karim, A. (2021c) *Shah Sultan Mahisawar (R)*, *Banglapedia*. Available at: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Shah_Sultan_Mahisawar_%28R%29 (Accessed: 14 Mar 2024).

Karim, A. (2021d) *Shah Sultan Rumi (R), Banglapedia*. Available at: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Shah_Sultan_Rumi_%28R%29 (Accessed: 10 Apr 2024).

Masud, A. A. (2017, January 1). *The contributions of Sufism in promoting religious harmony in Bangladesh*. Academia.edu. https://www.academia.edu/96141922/The_Contributions_of_Sufism_in_Promoting_Religious_Harmony_in_Bangladesh?rhid=28270112110&swp=rr-rw-wc-38386257

Masud, Abdullah Al, Abdullah, Md. F., & Amin, Md. R. (n.d.). *The contributions of Sufism in promoting religious harmony in Bangladesh*. Jurnal Usuluddin. https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/10213

Raisuddin, A. (2021) *Sufism, Banglapedia*. Available at: https://en.banglapedia.org/index.php?title=Sufism (Accessed: 09 May 2024).

Waiz, R. (2021, June 17). *Khanqah*. Banglapedia. https://en.banglapedia.org/index.php?title=Khanqah

What is Sufism? (2023) *The Idries Shah Foundation*. Available at: https://idriesshahfoundation.org/what-is-sufism/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwjLGyBhCYARIsAPqTz18aGyawXQwBbXoa8PgnXOZ7Ko5m5KXIGCIJX4DbxtpFcdTNMivj0LwaAoUJEALw_wcB (Accessed: 21 May 2024).

সূফী দরবেশদের অবদান. সুফিনিউজ২৪. (n.d.). https://ascalabus66.rssing.com/chan-58635140/latest.php

হামিদী আমীন শাহ (2020) প্রচলিত তরিকাসমূহের বর্ণনা, *sonalinews.com*. Available at: https://www.sonalinews.com/religion/news/116718 (Accessed: 13 Feb 2024).

আব্দুল মমিন চৌধুরী (সম্পা.), বাংলাদেশের ইতিহাস সুলতানি ও মোগল যুগ (আনু. ১২০০-১৮০০ সা, অব্দ) দ্বিতিয় খণ্ড সমাজ অর্থনীতি সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা: ১৭৯-২০৪, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ১০০০।

করিম, আব্দুল (২০১৭). বাংলার ইতিহাস: মোগল আমল, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১২০৫।

করিম, আব্দুল (২০১৮). বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১২০৫।

করিম, আব্দুল (২০২২). বাংলার ইতিহাস সমাজ ও রাজনীতি, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১২০৫।

করিম, মো. রেজাউল (২০০৭). *মুদ্রা ও মুদ্রাব্যবস্থা মধ্যযুগ থেকে পরবর্তী মধ্যযুগ*, সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পা.), প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, পৃষ্ঠা: ১১৫-১৩৮, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ১০০০।